কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর

'কর্ম্মাটাঁড়' শব্দের অর্থ—করমা নামে একজন সাঁওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাঁড় অর্থাৎ উঁচু জমি যাহা বন্যায়ও ডুবিয়া যায় না। এখন কর্ম্মাটাঁড়ে একটি ই. আই. আর লাইনের এই ষ্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর ষ্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারাণ্ডা ছিল; বাংলার চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি, চার-পাঁচ বিঘা হইবে, —সেইটি বাগান; বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আঁবের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আঁব গাছ ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরও নানা রকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থাগাছ ছিল। তখনকার ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ওখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন—I am the monarch of all I survey—বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মাটাঁড়ে যাওয়ায় তাঁহার আধিপত্যের একটু ক্ষতি হইয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুনজরে দেখিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কিছু হইল না, তখন তিনি নন-কোঅপারেশন করিয়া বসিলেন।

আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। এখানে আমার সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত; সেইজন্য লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশ দিন পূর্ব্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি—আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি; আমার সঙ্গে আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল; তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা কর্ম্মাটাঁড়ে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম। প্ল্যাটফরমের নীচেই বাংলা, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি কে? আমি পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন—আমি উহাদের খুব চিনি। ও যে তোমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে এতদূর কেমন করিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। তিনটার পর গাড়ি পৌঁছিয়াছিল; —সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম্. এ. ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পূরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্ম্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা

পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?—যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবিকুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি চাবিকুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি দরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।

পরদিন সকালে তালা খুলিয়া আমি ও সতীশ বাহির হইলাম। বাহির হইয়া যে-ঘরে পড়িলাম—দেখিলাম তাহার চারিদিকে ব্রাকেটের ওপর তাক, তাকের নীচে এক জায়গায় দেখি—এক হাঁড়া মতিচুর ও এক হাঁড়া ছানাবড়া, বোধ হয় বর্দ্ধমান হইতে আমদানি হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাণ্ডায় পাইচারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটাকুট করিতেছেন। যেভাবে প্রুফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি বলিলাম—কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিষ, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইল;—তাই সর্ব্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম—বাপ রে, এই বুড়া বয়সেও ইঁহার বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নজর।

রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আট গণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজারটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন—তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।

এইরূপ ভুট্টা কেনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে দুটা কুড়ি-বাইশ বছরের সাঁওতাল ছুঁড়ি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে। তাহারা উঠানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠিল না। আমি বলিলাম—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রহিয়াছে, দু-একটা দেন না। তিনি বলিলেন—দূর হ', ওরা কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলে টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। ওদের খাবার হইলেই হইল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক আছে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে কোরা বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেখানে এক মারহাট্টা রাজা আছে।

বারগীর হাঙ্গামার সময় এইখানে উহারা একটি ছোটখাট রাজত্ব করে। এখনও সেখানে অনেক মারহাট্টা আছে; ব্রাহ্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাঁওতালের সঙ্গে থেকে সাঁওতালের মত হইয়া গিয়াছে। তাদের কেবল ভাল খাবার দিলে তারা এক কামড় খাইয়া দেখে, পরীক্ষা করে, কি কি জিনিষে তৈরি জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আনানো হয়েছে; তখন আমি বুঝিতে পারি, এদের জিব আছে; আর এই এদের কিছুই নেই। মুড়ি চিঁড়াও যেমন খায়, সন্দেশ রসগোল্লাও তেমনি খায়।

আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখিয়া আমি বলিলাম—তবে আমি এক কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলা পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলি ইহাদিগকে দিয়া দি। তিনি বলিলেন—তোর সঙ্গে আছে নাকি? কই, দেখি। আমি দৌড়িয়া ষ্টেশনে গিয়া পোঁটলা খুলিয়া কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দুদিস্তা লুচি লইয়া আসিলাম। বলিলাম—দুদিন বাঁধা আছে, কলাপাতাগুলা সেদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হইয়াছে। বলিয়াই সেগুলা ঐ ছুঁড়িদের দিতে যাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমায় দে, ওদের কি অমন ক'রে দিতে আছে? বলিয়া লুচিগুলি লইয়া কলাপাতা খুলিয়া একটু হাওয়ায় রাখিয়া বলিলেন—এই দেখ্ কিছু গন্ধ নেই। তার পর মাঝখান হইতে চারখানা লুচি লইয়া বেশ সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম—আপনি ও কি করছেন? তিনি বলিলেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতের ভাজা? আমি বলিলাম—না বড়বউয়ের। তিনি বলিলেন—তবে আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। তার পর উপর হইতে দুখানি লুচি তুলিয়া সাঁওতালনীদের দিলেন। তারা টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—দেখ্‌লি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম—নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।

বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো

দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুক্‌না পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতার আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়; —ভারী ফুর্ত্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিদ্যাসাগর আমাদের স্নানাহার করাইলেন। বিদ্যাসাগর কখন যে কি খাইলেন এবং কোথায় খাইলেন আমরা তাহা কিছুই টের পাইলাম না। বারটার পর আমরা তাঁহার টেবিলে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন—তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। তুই লক্ষ্ণৌয়ে পড়াইতে যাইতেছিস্, পারবি কি? আমি বলিলাম—কেন, কিছু ভয়ের কারণ আছে না-কি? তিনি বলিলেন—আছে বইকি। সেখানে পুনো জ্যাঠা বলিয়া এক বাঙালী ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমি যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়িতেই ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যত্নে রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমারবাবু, এখানে ত অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্‌টি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে সে বলিল—ওমা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে-কামানো-কামানো, পাল্কীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমায় বলিল—বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির সিনিয়ার ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এন্ট্রেন্স পাস করে, সেও লেখে I has; যে এল্. এ. পাস করে, সেও লেখে I has; যে বি. এ. পাস করে, সেও লেখে I has; যে এম্. এ. পাস করে, সেও লেখে I has; এ জিনিষটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভারসিটির মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে-সময় লাহোর ছাড়া উত্তর-ভারতে আর ইউনিভারসিটি ছিল না। আগরা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, সিলোনও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমি দেখিলাম পুনোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বলিলাম—পূর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ হয়।

প্রথম গল্প।—আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দু স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্য্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের

একটা সখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মূর্ত্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এতগুলো ফরসা কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি খোলায়-ছাওয়া হল, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়া পালায় সেইজন্য ওই একটা দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সাম্‌নে একটা কল্‌সীর কানা, তার উপর একটা থেলো হুঁকো, নল্‌চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্‌চের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপরিভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়,—সামনে মাল্‌সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পুব দিকে সবাই মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিয়া আছে। আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়া ত হ'ল না, কিন্তু একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে।

যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল—চাণক চাণক। গোল করাত—মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল! কল ত গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ—মস্ত—ঘর-জোড়া, তার ওপর দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে; কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আক্‌ড়ায় দেখিলাম—পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাঁকনি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর পড়িতেছে। কোথাও ১ নং, কোথাও ২ নং, কোথাও ৩ নং সুরকী, কোথাও কুরুই পড়িতেছে।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—পূর্ণচন্দ্র, সব গুলিখোরের গল্প দিয়া আমি আর তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, শেষ গল্পটা দিয়াই তোমার কথার জবাব দি। যিনি আটখানা ইটের ওপর বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত ঘুরাইয়া বলিয়া দিলেন—ওসব কল কিছু না। তিনি বলিলেন—আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্য্যন্ত সব ধূ ধূ করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুরঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ; একটা দিয়ে পালে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি গাড়ি আক যাইতেছে; মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম—মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কি না।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি, —দেখাইয়া দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল্‌. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ বা এম. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈরি কি না!

দ্বিতীয় গল্প।—পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন, বই কাগজ, খাতাপত্র ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বক্স, রঙের বাক্স—এই সব কেনান, তাদের শেখান কি?—দেন কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয়; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা—সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময়ে যারা আমাদের গ্রাম থেকে ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মর্ম্ম জানে। সব ত জলে জলময়, —কেবল মনের আট্‌কালে রাস্তাটা কোথা দিয়েছিল—তারা তাই আঁচিয়া লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্ব্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না। তার ওপর কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর-জল; মাঠে এর চেয়ে বেশী জল হয় না; এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া তারা একটা বাঁশের টঙ দেখিতে পায়—জল ছাড়া প্রায় বিশ হাত উঁচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন,

একখানা মই তাতে লাগানো। অনেক কষ্টে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল—মাঝি, আমায় পার ক'রে দাও। সে বলিল—মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময়ে যাহা রাখেন তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে; নৌকায় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই; বন্যার সময় নদীতে লগি দিয়া থাই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাষ্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গেঁ। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে। আমরা উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা চিরদিনই আমাদের মনে গাঁথা থাকিবে। আমরা যেন কোনো মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইতেছি। দেখুন, প্রায় বাহান্ন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে।